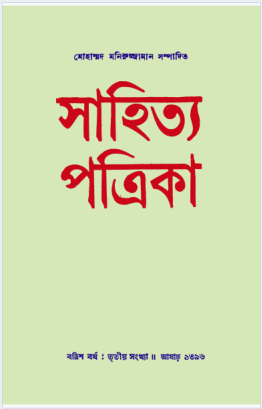

Vol. 32 | No. 3 | 1989

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনা কতিপয় বৈশিষ্ট্য ও একটি প্রস্তাব

Volume	32
Issue	3
Year	1989
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	সাঈদ-উর রহমান
Published online	June 1, 1989
DOI	10.62328/sp.v32i3.4
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v32i3.4
Pages	43-58
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনা

কতিপয় বৈশিষ্ট্য ও একটি প্রস্তাব

সাঈদ-উর রহমান

বাংলা সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস প্রথম রচনা করেন বহরমপুর কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন। তাঁর 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' নামক বইটির প্রথম ভাগ বেরোয় ১৮৭২ সালে এবং প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ মিলে পূর্ণাকারে প্রকাশিত হয় দুই বছর পর ১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দে। পরবর্তী একশ বছরে রচিত ও প্রকাশিত হয়েছে শতাধিক গবেষকের ১৪০টির মত বই—অধিকাংশই ইতিহাসের অংশবিশেষ অবলম্বনে রচিত, ধারাবাহিক ইতিহাস লিখিত হয়েছে অল্প কয়টি। প্রধান বইগুলো হল রমেশচন্দ্র দত্তের The literature of Bengal (১৮৭৭), দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' (১৮৯৬), সুকুমার সেনের 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (চারখণ্ড, ১৯৪০-), নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ানের 'বাঙ্গালা সাহিত্যের নূতন ইতিহাস' (তিন খণ্ড, প্রথম খণ্ড ১৯৫০), মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র 'বাংলা সাহিত্যের কথা' (দুই খণ্ড, ১৯৫৭-৬৫), অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' (নয় খণ্ডে পরিকল্পিত, পঞ্চম খণ্ড পর্যন্ত প্রকাশিত, প্রথম খণ্ড ১৯৫৯), কাজী দীন মুহম্মদের 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' (চার খণ্ড, ১৯৬৮-৬৯) ও আহমদ শরীফের 'বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য' (দুই খণ্ড, ১৯৭৮-৮৩)। তাছাড়া রয়েছে ছাত্রপাঠ্য কয়েকটি ভাল বই—শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসুর 'বাঙ্গালা সাহিত্য' (পাঁচ খণ্ডে পরিকল্পিত, দুই খণ্ড পর্যন্ত প্রকাশিত, ১৯৪৬-৪৭), গোপাল হালদারের 'বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা' (দুই খণ্ড, ১৯৫৪-৫৮), ভূদেব চৌধুরীর 'বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা' (দুই খণ্ড, ১৯৫৪-৫৭), মনোমোহন ঘোষের 'বাংলা সাহিত্য' (১৯৫৫), ভোলানাথ ঘোষের 'বাঙলা সাহিত্য পরিক্রমা' (১৯৫৭), শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা'

(১৯৫৯)। অংশবিশেষ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন ও করছেন অনেকে—প্রথমে মনে পড়বে অজিতকুমার ঘোষ, আনিসুজ্জামান, আশুতোষ ভট্টাচার্য, কাজী আবদুল মান্নান, মুহম্মদ এনামুল হক, সুশীল-কুমার দে প্রমুখ পণ্ডিতের নাম। [১৯৭৮ সাল পর্যন্ত রচিত গ্রন্থগুলোর পূর্ণাঙ্গ তালিকা রয়েছে আহমদ শরীফের 'বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের পরিশিষ্টে।]

দুই

বঙ্গদেশের ইতিহাস প্রথম রচনা করেন ইংরেজরা। চার্লস স্টুয়ার্ট, জন ক্লার্ক, মার্সম্যান, রোফার লেথব্রিজ গত শতকেই ইতিহাস লিখে-ছিলেন ও সেগুলো স্কুলে পড়ানো হত। বর্তমান শতাব্দীতে বাংলার প্রথম গভর্নর লর্ড কারমাইকেল বঙ্গভঙ্গ রোধের পরের বছর ১৯১২ সালে বিশেষভাবে উদযোগী হয়েছিলেন ইতিহাস-রচনায়। তাঁর প্রস্তাব ছিল হিন্দু, মুসলমান ও ব্রিটিশ—এই তিন খণ্ডে ইতিহাস লেখার। প্রস্তাবটি বাস্তবায়িত হয়নি তবে কাঠামোটি ও সময়টি মনে রাখার মত। কাঠামোটি স্পষ্টতই, বিভ্রান্তিকর ও অসংগত ছিল। শাসক-গোষ্ঠীর ধর্মকে মাপকাঠি ধরলে নামকরণ হতে পারত হিন্দু-বৌদ্ধ যুগ, মুসলমান যুগ ও খ্রীস্টান যুগ; জাতি ও বংশবিচারকে মান্য করলে হয়ত করা যেত পাল সেন তুর্ক পাঠান মোগল ব্রিটিশ প্রভৃতি। কিন্তু নাম দেওয়া হল অংশত ধর্ম দিয়ে, অংশত জাতীয়তার ভিত্তিতে। ব্রিটিশ ঐতিহাসিকেরা এভাবে বঙ্গদেশের ইতিহাসকে হিন্দু ও মুসলমান নামে দুইযুগে ভাগ করলেন, পরবর্তীকালে বিদায় নেবার প্রাক্‌কালে ব্রিটিশ শাসকরা ভূগোলকেও ধর্মের ভিত্তিতে দুইভাগে বিভক্ত করে দিয়ে গেলেন।

এই পটভূমি বলা হল এই জন্য যে, ইংরেজ কর্তৃক পরিকল্পিত যুগবিভাগ এখনো সচেতন বা অচেতনভাবে ইতিহাস রচনায় ব্যবহৃত হয়—সে ইতিহাস রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক যাই হোক না কেন। তের শতকের প্রথম দশকে, বখতিয়ার খিলজির বঙ্গভূমিতে পদার্পণ করার সাথে সাথে প্রাচীন যুগের খোলস ত্যাগ করে বঙ্গদেশ মধ্য

যুগে উপনীত হয় বলে বিশ্বাস করা হয় ও তদনুসারে ইতিহাস রচিত হয়। অথচ এটা সবাই জানেন যে, বৃহৎ বঙ্গভূমির এক অতি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র এই তুর্কীবীর জয় করেছিলেন এবং দেশের অধিকাংশ অঞ্চল পরবর্তী একশ বছর ধরে পূর্বতন শাসকদেরই অধিকারে ছিল।

আমাদের আলোচনা সাহিত্যের ইতিহাস নিয়ে। এখানেও, সাধারণত তের শতককে প্রাচীন ও মধ্য যুগের সীমানা ধরা হয় এবং লেখকেরা, যার-যার মনের প্রবণতা অনুযায়ী তের-চৌদ্দ শতককে অন্ধকারের যুগ বা নবীন যুগের সুপ্রভাত বলে চিহ্নিত করেন। নতুন কালের নাম দেওয়া হয় মধ্য যুগ, গৌড়ীয় যুগ, তুর্কী যুগ বা চৈতন্য যুগ বলে। তেরো শতকের আগেও একটি যুগ কল্পিত হয় ও নামকরণ হয় আদি যুগ, প্রাচীন যুগ, হিন্দু-বৌদ্ধ যুগ বা প্রাক্-তুর্কী যুগ। মধ্যযুগের অপর উপবিভাগ করা হয়—মুসলমান সাম্প্রদায়িকদের মতে তুর্কী যুগ, পাঠান যুগ, স্বাধীন সুলতানী যুগ ও মুগল যুগ—হিন্দু সাম্প্রদায়িকদের মতে প্রাক্-চৈতন্য যুগ, চৈতন্যযুগ ও উত্তরচৈতন্য যুগ প্রভৃতি।

অথচ ইসলাম ধর্মাবলম্বী ভাগ্যান্বেষী ইখতিয়ার উদ্দীনের নদীয়া বিজয়ের ফলে বাংলা সাহিত্যে সরাসরি কি প্রভাব পড়ল সে-বিষয়ে কিছু বলা হয় না। কয়েকটি নেতিবাচক দিক উল্লেখ করা হয় এবং তার সমর্থনে নজির টানা হয় নেপাল থেকে চর্যাগীতিকার পুঁথি আবিষ্কারের ঘটনাকে। প্রচলিত মতটি হল যে, দশম থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত সময়ে বাংলা ভাষায় চর্যাপদ রচিত হয়েছিল—তুর্কীদের বাংলা আগমনের ফলে সৃষ্ট অরাজক অবস্থায় সাহিত্য চর্চার ধারা ব্যাহত হয় এবং পণ্ডিতেরা পুঁথিপত্র নিয়ে নেপালে পালিয়ে আত্মরক্ষা করেন। আবার পূর্নোদ্যমে সাহিত্য চর্চা শুরু হয় চোদ্দ শতকের মাঝামাঝি থেকে—বঙ্গে ইলিয়াস শাহী রাজত্ব কায়েম হলে। মাঝখানের দেড়শ বছর তাই অন্ধকারের বা শূন্যতার। ভূদেব চৌধুরী লিখেছেন: 'তারপরে প্রায় সার্ধশতাব্দী ধরে বাংলার মাটিতে রাজ্যলিপ্সা, জিঘাংসা, যুদ্ধ, হত্যা, আততায়ীর হস্তে মৃত্যু—নারকীয়তার যেন আর সীমা ছিল না। সংগে সংগে বৃহত্তর প্রজা সাধারণের জীবনেও উৎপীড়ন, লুণ্ঠন, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা ও ধর্মহানির সম্ভাবনা উত্তরোত্তর উৎকট হয়ে উঠেছে।··· প্রধানতঃ এই কারণেই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ১২০০ খ্রীস্টাব্দ থেকে

চতুর্দশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত কাল সৃজনহীন উষরতায় শূন্য হয়ে আছে।' (বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৪, তৃতীয় সং)। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমতও অনুরূপ— 'তারপর দুইশত বৎসর ধরিয়া দুঃসহ মাৎস্যন্যায়, লোভ-লোলুপতা, ষড়যন্ত্র, চরিত্রভ্রষ্টতা এবং মরু পর্ব্বতবাসী তাতার-তুর্কী-হাবসী-খোজার রক্তোৎসবের উন্মত্ততায় বাঙালী সংস্কৃতির মঙ্গলদীপটি নিভিয়া গেল।' (প্রাচীন বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য, পৃ. ১৬)

পাশাপাশি পাওয়া যায় উলটো কথা। মুহম্মদ এনামুল হকের মতে—'তাঁরা [সেন রাজারা] অবহট্ট বা অপভ্রংশের খোলস থেকে মুক্তি-সচেষ্ট বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আদ্যশ্রাদ্ধ শুরু করলেন নিজের দেশেই, এবং যাঁরা এই ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা করতেন, তাদেরকে নেপালের পর্বত-কন্দরে আশ্রয় নিতে বাধ্য করলেন। তাই প্রাচীনতম বাংলা-ভাষা ও সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন মিলল নেপালে—বাংলাদেশে নয়।" (মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য, ভাষা ও সাহিত্যসপ্তাহ, ১৩৭০, পৃ. ৪০)

অথচ, প্রকৃত ঘটনার মূল হয়ত এই দুই বিপ্রতীপ ধারণার বাইরে কোথাও খুঁজতে হবে। চর্যাপদ নিয়ে বিতর্কের কোন সুরাহা এখনো দেখা যাচ্ছেনা—নিশ্চয়ই একদিন সব প্রশ্নের সন্তোষজনক সমাধান পাওয়া যাবে। অনেককিছুই এখনো অনুমানের পর্যায়ে রয়েছে। তবে চর্যাপদগুলো সংকলনের একটি সম্ভাব্য সমাধান হতে পারে এরূপ ঃ অষ্টম থেকে দশম শতাব্দী পর্যন্ত সময়ে জীবিত সিদ্ধাচার্যরা মুখে-মুখে বা লিখিত ভাবে অনেক গান রচনা করেছিলেন ঃ সেগুলোর মধ্য থেকে একশটি গান চয়ন করে একটি সংকলন তৈরী হয়েছিল—পরবর্তীকালে তা থেকে পঞ্চাশ বা একান্নটি বাছাই করে নতুন একটি সংকলন প্রস্তুত হয়েছিল। তেরো অথবা চৌদ্দ শতকের বাঙালী মুনিদত্ত সংস্কৃত ভাষায় স্বতন্ত্রভাবে নতুন সংকলনের টীকা রচনা করেছিলেন। তারও পরে নতুন সংকলন ও মুনিদত্তের টীকা মিলিয়ে একটি পুঁথি প্রস্তুত করা হয়েছিল—যে পুঁথি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালের রাজদরবারের গ্রন্থাগারে পেয়ে অনুলিপি করিয়ে কলকাতায় নিয়ে এসেছিলেন ১৯০৭ সালে।

[তারাপদ মুখোপাধ্যায়]

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, চর্যাগীতিকার নেপালে যাওয়ার সঙ্গে সেন-রাজাদের অত্যাচার বা তুর্কীদের সঙ্গে অভিযান কোনটির সরাসরি সম্পর্ক স্থাপন করা দুঃসাধ্য। আসলেও সে-ধরনের কোন সম্পর্ক ছিলনা। প্রচলিত ইতিহাস-বইগুলোতে যা বলা হয়েছে, তা প্রকৃতপক্ষে ইচ্ছাপূরণের কিস্‌সা মাত্র।

ধর্মপ্রচারের সূত্রেই লৌকিক ভাষায় সাহিত্য তথা ধর্মসাহিত্য রচনা শুরু হয়। সেভাবে কথ্য ভাষার সাহিত্যিক ভাষায় উত্তরণ ঘটে। বাংলা সাহিত্যের বেলায়ও তেমনটি ঘটেছিলো। বৌদ্ধ ধর্মের বিবর্তনের যুগে সহজিয়া বৌদ্ধরা চর্যাপদ রচনা করেন, চৌদ্দ-পনের শতক থেকে হিন্দু সমাজ তথা হিন্দু ধর্মের পুনর্গঠনের কালে বুদ্ধিজীবীরা নিজ ধর্মের বা উপাস্যের মাহাত্ম্যকথা মাতৃভাষায় লিখতে থাকেন, তার প্রতিক্রিয়ায় মুসলমানেরা শুরু করেন ইসলামের কথা দেশি ভাষায় লিপিবদ্ধ করতে। এমনকি উনিশ শতকে ব্রাহ্মধর্মাবলম্বীরাও অনুরূপ প্রেরণায় বাংলা গদ্যের বিকাশ ত্বরান্বিত করেন। মধ্যযুগে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশে, সেজন্য, হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধের দান সমভাবে স্মরণীয়। সাহিত্যের ইতিহাস রচনার প্রথম যুগে সে-পটভূমি জানা না-থাকায় তৎকালীন পণ্ডিতদের—যাঁরা ঐতিহাসিক কারণে একই ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন—রচিত গ্রন্থগুলোতে একান্তভাবে হিন্দু ধর্ম বিষয়ক রচনাই আলোচিত হয়েছিল, এমনকি এমন ধারণা বর্তমান শতাব্দীতেও প্রচলিত ছিল যে, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য মানেই হিন্দুর ভাষা ও হিন্দুর সাহিত্য। রমেশচন্দ্র দত্তের বইয়ের তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকায় (১৯৬২) প্রকাশক নির্দ্বিধায় মন্তব্য করেছেন যে,—"The Bengali Language is charged with Hindu sentiment, and Bengali literature is essentially a Hindu literature। পরবর্তীকালে, মুসলিম রচিত পুঁথিপত্রের সন্ধান পাওয়া গেলে, এমনকি সম্পাদিত হয়ে প্রকাশিত হবার পরও, অনেকে সেটা স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হলেন—অনেকটা মীর মশাররফ হোসেন বা কায়কোবাদের বাংলা লেখা নিয়ে সেকালে সন্দেহ করার মত। বাংলা সাহিত্যের সর্ববৃহৎ ইতিহাস রচয়িতা অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় খোলাখুলি বলেছেন—'আজকাল পূর্ব পাকিস্তানের গবেষকগণ অনেক নতুন পুঁথি আবিষ্কার করছেন, সেগুলি নাকি অতি পুরাতন। এ বিষয়ে নিঃসংশয় হয়ে মত দিতে আমরা অক্ষম। কারণ দীনেশচন্দ্র,

নগেন্দ্রনাথ বসু, রামেন্দ্রসুন্দর, এবং সাহিত্য পরিষদের কর্তৃপক্ষের চেষ্টায় গোটা বাংলাদেশ থেকে বহু পুঁথি সংগৃহীত হয়। স্যার আশুতোষের আনুকূল্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও অনেক পুঁথি ক্রয় করেন। আবদুল করিম সাহেব তখন থেকেই পুঁথি সংগ্রহ করছেন। অথচ তিনি তথাকথিত পুরাতন পুঁথি (মুসলমান কবি রচিত) সম্বন্ধে পাকিস্তান হবার আগে কোথাও কিছু বলেননি, আর পাকিস্তান হয়ে যাবার পর, পূর্ব পাকিস্তান থেকে যদি এত প্রাচীন মুসলমান কবির আবির্ভাব হয়, তাহলে তো সন্দেহ জাগাই স্বাভাবিক। কারণ ইতিপূর্বে পুঁথি নিয়ে বাংলাদেশে [অবিভক্ত বঙ্গে: লেখক] অনেক গোলমাল হয়েছে। সে যাই হোক, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সংগৃহীত এবং অধুনা পূর্ব বাংলার গবেষকগণ কর্তৃক আবিষ্কৃত মুসলমান কবিদের প্রাচীন পুঁথির প্রামাণিকতা সম্বন্ধে আমরা কোন দায়িত্ব নিতে পারিনা।' (বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, ৩য় সং, ১৩৭৮, পৃ. ২৬২-৬৩)

এর স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ট পূর্ব পাকিস্তানের বা বাংলাদেশের কারো কারো লেখায়। বাংলা ভাষাকে দেখানো হয়েছে দ্রাবিড় ভাষা, এমনকি সেমেটিক গোত্রের ভাষা বলে, প্রস্তাব এসেছে দোভাষী পুঁথির ভাষাকে একালের সাহিত্যের ভাষার আদর্শ করার। প্রণয়োপাখ্যানসমূহ—যেগুলোর অধিকাংশই মুসলমান কবিদের হাতে পুষ্ট হয়েছে—নিয়ে অতিরিক্ত উচ্ছ্বাস দেখা গেছে। গৌড়ের সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতা নিয়ে বাড়াবাড়ি করার কথা সবার জানা। একজন গবেষক উচ্ছ্বসিত ভাষায় বলেছেন—'সংস্কৃতবান মুসলমান সুলতানদের নেক নজর শতাব্দীকালের যেন জীয়নকাঠি।··· রাজকুমার (ভাষান্তরে মুসলমান সুলতান) এলেন ঘোড়ায় চড়ে, বাংলার মসনদে বসলেন, ব্রাহ্মণ্য তেজ সংহত হল, শাপমুক্ত বাংলা ভাষার সেদিন বিজয়াভিযান সূচিত হল।' (ওয়াকিল আহমদ, সুলতান আমলে বাংলা সাহিত্য, ১৩৭৪, পৃ. ৩)।

এ-ধরনের বাড়াবাড়ির একটি চমৎকার উদাহরণ হল শাহ মুহম্মদ সগীর-এর কাল নির্ণয়। মুহম্মদ এনামুল হক ও আহমদ শরীফের মতে তিনি চতুর্দশ শতাব্দীর একেবারে শেষের দিকে বা পঞ্চদশ শতাব্দীর গোড়ায় বাংলার সুলতান গিয়াসুদ্দিন আজম শাহের আমলে

(১৩৮৯–১৪১০) 'ইউসুফ-জোলেখা' নামক কাব্য রচনা করেছিলেন। এ-সিদ্ধান্ত মেনে নেবার পক্ষে যুক্তি অত্যন্ত দুর্বল, এবং সংগত ভাবেই অন্যান্য গবেষক সগীরের সময়কাল ১৬৩০ সালের কাছাকাছি সময়ে নির্দেশ করেছেন। কিন্তু সেসব যুক্তির সদুত্তর না-দিয়ে ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত এ বইয়ের ভূমিকায় ডক্টর হক ও ডক্টর শরীফ অসহিষ্ণুভাবে বিপরীত মত প্রত্যাখ্যান করেছেন।

ইতিহাস রচনার জন্য প্রথমে প্রয়োজন কবি ও কাব্যের সময় নির্ভরযোগ্য ভাবে নির্ধারণ করা। কাজটি খুবই দুরূহ। অভ্যন্তরীণ অসুবিধার পাশাপাশি রয়েছে, অনেক ক্ষেত্রে, গবেষকের সাম্প্রদায়িক ও আঞ্চলিক মনোভাব। কবির কৌলীন্য বিচারের অন্যতম মাপকাঠি তাঁর প্রাচীনতা হওয়ায় প্রিয় কবিকে প্রাচীন কালের দিকে ঠেলে দেবার, নিজের বাড়ির কাছে অথবা স্বীয় ধর্মের ভেতর টেনে আনার প্রবণতা পণ্ডিতদের মধ্যে একেবারে দুর্লক্ষ্য নয়। পুঁথি জাল করার ঘটনাত অনেকই ঘটেছে। যে-দুর্লভ পুঁথিটিতে রচনাকাল উল্লেখিত আছে, সেটি চিরকালের জন্য অদৃশ্য হওয়ার নজিরও রয়েছে। মুহম্মদ এনামুল হক শুধু শাহ মুহম্মদ সগীরকে পনের শতকে নেননি, আলাওলের জন্মভূমিও নিয়ে গেছেন ফরিদপুরের পরিবর্তে চট্টগ্রামে। আহমদ শরীফ কবি সৈয়দ সুলতানকে 'প্রমাণের অপেক্ষা' না-করেই চট্টগ্রাম জেলার লোক বলে সাব্যস্ত করেছেন—যদিও সিলেটের দাবি একেবারে অগ্রাহ্য করার মত নয়। উল্লেখযোগ্য যে, ডক্টর হক ও ডক্টর শরীফ দুজনেরই বাড়ি চট্টগ্রাম জেলায়।

আঠার-উনিশ শতকের বাউল সাধক লালনকে নিয়েও অনুরূপ টানা-হেঁচড়া চলছে। হিন্দু পণ্ডিতদের মতে তিনি হিন্দু সন্তান, আর অনেক মুসলমান গবেষকের মতে তিনি মুসলমান সন্তান। তাঁর পৈতৃক নিবাস কুষ্টিয়ায় ছিল বলে এতদিন জানা ছিল, কিন্তু সম্প্রতি যশোহরের গবেষক ডক্টর এস. এম. লুৎফর রহমান এমন একটি পুরানো খাতা আবিষ্কার করেছেন যাতে পরিষ্কার ভাবে লেখা আছে যে, লালনের বাড়ী ছিল যশোহর জেলার ঝিনাইদহ মহকুমার হরিশপুর গ্রামে। তিনি একটি লালন জীবনীও খুঁজে পেয়েছেন, যা-থেকে মুসলমান-সন্তান হিসেবে কবির পরিচিতি সম্পর্কে আর কোন সন্দেহ থাকে না!

মনসামঙ্গল কাব্যের দুজন নামকরা কবি পূর্ববাংলার বিজয় গুপ্ত ও পশ্চিম বাংলার বিপ্রদাস পিপিলাইকে নিয়েও বিতর্ক আছে। কিশোরগঞ্জ জেলার মানুষ অধ্যাপক অশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে বিজয়গুপ্ত পনের শতকের শেষে আবির্ভূত হয়েছিলেন; কিন্তু বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের নামে প্রচলিত কাব্যটি 'উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগের পূর্ববর্তী হওয়া অসম্ভব।' (বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, ৫ম সংস্করণ, পৃ. ৩৩৬)। অপরদিকে বর্ধমানের ডক্টর সুকুমার সেনের মতে মনসামঙ্গল ধারার 'সবচেয়ে পুরানো কবি' বিপ্রদাস পঞ্চদশ শতকের শেষ দশকে জীবিত ছিলেন, কিন্তু বিজয়গুপ্ত যে পনের শতকের কবি সে-বিশ্বাসের 'সমর্থনে বিন্দুমাত্র প্রমাণ নাই, এমনকি যুক্তিযুক্ত সংশয়েরও স্থান নাই।' (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পূর্বার্ধ, ৬ষ্ঠ সং, পৃ. ২৪৮)।

পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিম বঙ্গের এই বিরোধ অবশ্য নতুন ব্যাপার নয়। সাহিত্যের ঐতিহাসিকদের মধ্যে যেমন বিরোধ আছে, তেমনি প্রাচীন সাহিত্যেও তার রেশ খুঁজে পাওয়া যায়। মহাভারত-অনুবাদের ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু তাঁর আভাস লক্ষ্য করেছিলেন। তিনি বলেছেন—'এই সকল মতবিরোধের মূলে পূর্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গ ঘটিত ঝগড়ার আভাস পাওয়া যায়। পূর্ববঙ্গের দীনেশ বাবু সঞ্জয়, কবীন্দ্র ও শ্রীকর নন্দীকে মহাভারতের আদি রচয়িতা রূপে নির্দ্দেশিত করিয়াছিলেন, আর পশ্চিম বঙ্গের নগেন্দ্রবাবু সঞ্জয় ও কবীন্দ্রের রচনার সামঞ্জস্য থাকা সত্ত্বেও বিজয়ের গ্রন্থকে কবীন্দ্রের পূর্ব্বে স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।' (বাঙ্গালা সাহিত্য, ২য় খণ্ড, কলকাতা: ১৯৪৭, দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃ. ২৮)

মঙ্গল কাব্যের দেবীদের মূল খুঁজতে গিয়েও দুই পণ্ডিত দুই বিপরীত মেরুতে হাজির হন—ডক্টর ভট্টাচার্য মূল লক্ষ্য করেন প্রাক্-আর্য বা অন্-আর্য ঐতিহ্যে, আর ডক্টর সেন উৎস খোঁজেন বৈদেশিক আর্য সংস্কারে। চণ্ডীদেবীর উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে প্রথমজনের ধারণা হচ্ছে—'বিভিন্ন সময়ে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের বিবিধ স্থানীয় অবস্থা হইতে অনেক সময় পরস্পর স্বতন্ত্র প্রকৃতির যে-সকল স্ত্রীদেবতার পরিকল্পনা করা হইয়াছিল, তাহাই কালক্রমে এক সাধারণ চণ্ডী নামের মধ্যে আসিয়া স্থান লাভ করিয়াছে।' (ঐ, পৃ. ৪১৬) আর দ্বিতীয় জন মনে করেন—

'ঋগবেদের সূক্তটি ভালো করিয়া পড়িলে কোনই সন্দেহ থাকেনা যে, এই অরণ্যানীই [ঋগবেদের এক দেবী] বহু শত শতাব্দের ইতিহাস বাহিয়া নানা কবি কল্পনার রঙে ডুবিয়া ও বিচিত্র লোক ভাবনার পাঁকে জড়াইয়া পুরানো বাঙ্গালা সাহিত্যে চণ্ডী মঙ্গলের অধিদেবী মঙ্গল চণ্ডী রূপে দেখা দিয়াছিলেন।' (ঐ, পৃ. ৫০৪-৫০)

তিন

ইতিহাস-রচনায় বা সে-বিষয়ে আলোচনায় প্রধান হয়ে আসে তত্ত্ব ও পদ্ধতির প্রশ্নটি। বাংলা ভাষায় অনেকগুলো ইতিহাস-পুস্তক লেখা হলেও সে-সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা হয়নি। দীনেশচন্দ্র সেন, সুকুমার সেন, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ও মুহম্মদ এনামুল হকের মত বিদগ্ধ ইতিহাসকারেরা বইয়ের ভূমিকায়ও কিছু বলেননি। অন্যরা ইংগিতে যা বলেছেন, সেটাই আলোচনার একমাত্র ভিত্তি। তাঁদের প্রধান অংশটি, ইতিহাসের ধারায় সাহিত্যের মধ্য থেকে জাতীয় মনের বিকাশ ও প্রকাশকে অনুসন্ধান করা জরুরী বিবেচনা করেছেন। সাহিত্যের মূল্যায়ন তাঁদের বইয়ে পাওয়া গেলেও সেটা মুখ্য হয়ে ওঠেনি। এই চিন্তার সূত্রপাত রমেশচন্দ্র দত্ত থেকে। ইতিহাস-রচনার কালে তাঁর লক্ষ্য ছিল to trace the progress of the National mind in its various aspects as reflected in the nation's literature। তিনি মনে করতেন যে, The literature of every Country slowly expanding through successive ages reflects accurately the manners and customs, the doings and thoughts of the people। জনপ্রিয় ইতিহাস গ্রন্থ 'বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা'র ভূমিকায় শ্রীভূদেব চৌধুরী লিখেছেন যে, 'অপেক্ষাকৃত সুপরিজ্ঞাত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত তথ্যাবলীকে বাঙালি জীবন ধর্মের পরিপ্রেক্ষিতে সাজিয়ে তোলার চেষ্টাই' তাঁর এক মাত্র সাধনা। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধারণাও অনেকটা কাছাকাছি। পূর্বসুরিদের গবেষণা থেকে 'প্রয়োজনীয় উপাদান' সংগ্রহ করে তিনি তাঁর ইতিহাসে 'বাংলা সাহিত্য ও বাঙালী মানসের সম্পর্ক' নিয়ে আলোচনা করেছেন। হাল আমলের নামকরা ইতিহাসবিদ আহমদ শরীফও একই পথের অভিসারী। 'বাঙালীর রচনায় বাঙালী চিত্ত-চরিত্রের যে প্রকাশ ঘটেছে তা-ই মুখ্যত জানবার-বুঝবার' চেষ্টা তিনি করেছেন। সেজন্য তাঁর বইয়ের নাম 'বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য'।

ইতিহাস-রচনার এই দর্শন ইউরোপে বহুলভাবে অনুসৃত হত এক-কালে। গত শতকে ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাস লিখতে গিয়ে ফরাসী পণ্ডিত হিপ্‌পোলাইট আডোলফ টেইন এর প্রয়োগ ও প্রবর্তন করেন। ইংরেজ সমালোচক হাডসন পরবর্তীকালে পরিমার্জিত করে তার ব্যব-হার যোগ্য রূপ দেন। An Introduction to the study of Literature গ্রন্থে সাহিত্যের ইতিহাসের প্রকৃতি সম্পর্কে তিনি লিখেছেন—It is the progressive revealation, age by age, of···nation's mind and cha-racter। হাডসনের বইটি আমাদের দেশেও বেশ জনপ্রিয়।

এই ধারার বাইরে যাঁরা আছেন, তাঁদের কেউ কেউ সাহিত্যালো-চনাকে অধিক গুরুত্ব দেবার পক্ষপাতী। অবশ্য, সাহিত্যের বিকাশে বাইরের ঘটনাকে প্রধান নিয়ন্ত্রণীশক্তি হিসেবে তাঁরাও মনে করেন। গোপাল হালদারের অভিমত সংক্ষিপ্ত, কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ। সাহিত্যের ইতিহাসকে তিনি সাংস্কৃতিক ইতিহাসের অঙ্গ বলে বিবেচনা করেন, এবং স্বায়ত্তশাসনের আওতায় রেখে ইতিহাস রচনা করতে চান। তাঁর ভাষায়—'সাহিত্যের ইতিহাস শুধু ইতিহাসও নয়, সাহিত্যের স্বায়ত্ত এলাকায় সৃষ্টিপ্রেরণার ও সৃষ্টি ঐতিহ্যেরও প্রকাশ ও বিকাশ, সাহিত্যের আপনক্ষেত্রে স্বরাজলাভ।' 'মনোমোহন ঘোষ রচিত' 'বাঙ্গালা সাহিত্য' স্বল্পপরিচিত সাহিত্য-ইতিহাস। তিনি মোটামুটি বিস্তারিতভাবে তাঁর অবলম্বিত পদ্ধতি ভূমিকায় ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর পরিকল্পিত পদ্ধতি হচ্ছে: আলোচ্য কালকে বিভিন্ন যুগে বিভক্ত করা, প্রতি যুগের প্রতিনিধিত্ব-শীল যুগপ্রেরণাকে চিহ্নিত করে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী যুগের সঙ্গে তার সম্পর্ক নির্দেশ করা; প্রতি যুগের বিশিষ্ট লেখকের পূর্ণাঙ্গ জীবনকাহিনী বর্ণনা করা; তাঁর প্রধান রচনাসমূহ বিশ্লেষণ ও আলোচনা করে দেখানো যে, সেগুলো লেখকের নিজস্ব সত্তা ও যুগসত্তাকে ধারণ করে; চিত্তাকর্ষক উপায়ে আলোচনা করা; এবং সর্বশেষে, সরল আঙ্গিক কিভাবে ধীরে ধীরে কলাকৌশলময় হয়ে ওঠে সেটা প্রদর্শন করা।

আর একজন পণ্ডিতের মত উল্লেখ করে এই প্রসঙ্গ শেষ করা যেতে পারে। তিনি ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ—'আযাদী উত্তর' পূর্ব পাকিস্তানে সর্ববৃহৎ ও পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসের রচয়িতা। তাঁর মতে সাহিত্যের ইতিহাসে থাকবে 'সাহিত্যের ধারাবাহিকতা, তার রূপ ও রেখা সম্বন্ধে

আলোচনা,' 'সাহিত্যের বিশুদ্ধ রস', 'সমাজ বিবর্তনে মানুষের ক্রমবিকাশ', 'জাতীয় জীবনের মানস প্রতিফলনের সুষ্ঠু রূপায়ণে অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এ তিনের সমন্বয়' সাধনের ছবি। তিনি আরো মনে করেন যে সাহিত্যের ইতিহাসের একটি 'অবশ্য প্রয়োজনীয় দায়িত্ব' হচ্ছে জাতীয় জীবনের মনোবিশ্লেষণ করা, ব্যক্তি ও সমাজজীবনের সুষ্ঠু আদর্শের রূপ তুলে ধরা, এবং 'অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রবৃত্তি' হচ্ছে তথ্য ও তত্ত্বের সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ ও সাহিত্যের গতি প্রকৃতির মূল্যায়ন।

এই মত, বলাইবাহুল্য, অনাবশ্যক চিন্তার সমাহারে বিশিষ্ট ও ববহার অনুপযোগী।

চার

আধুনিক-পূর্ব কালের সাহিত্যকর্মকে সামগ্রিক বিবেচনায় বিষয়ানুসারে বিন্যস্ত করার চেষ্টা প্রচলিত ইতিহাসগুলোতে বিশেষ হয়নি—যদিও ইতিহাস রচনা করতে গেলে সেটার প্রয়োজনীয়তা অনেক। বিশাল বাংলা সাহিত্যের সম্পদ সম্পর্কে কম জানা থাকায় গত শতকে তার গুরুত্ব বেশি ছিল না। বিশ শতকে নতুন নতুন পুথি আবিষ্কারের ফলে বিষয়-বৈচিত্র্য ও রূপভেদ দেখা দেয় এবং সেগুলোকে শ্রেণীবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা অনিবার্য হয়ে ওঠে। ইতিমধ্যে অবশ্য অনেকে বিন্যাস করেছেন এবং সেগুলো সুপরিচিত আমাদের কাছে। দীনেশচন্দ্র সেন বিন্যাস করেছেন অনুবাদ শাখা, লৌকিক ধর্ম শাখা, পদাবলী শাখা, চরিতশাখা, কাব্যশাখা, গীতি শাখা নাম দিয়ে। তাঁর বিন্যাসের ত্রুটি হল যে, একই সঙ্গে তিনি ব্যবহার করেছেন তিনটি মাপকাঠি—আঙ্গিক, রচনাপদ্ধতি ও বিষয়বস্তু। ভূদেব চৌধুরীর বিষয়-বিভাগ হল অনুবাদ সাহিত্য, বৈষ্ণব পদসাহিত্য, বৈষ্ণব জীবনীসাহিত্য, মঙ্গলসাহিত্য, রোসাঙ্গে মুসলমানী সাহিত্য, গীতিসাহিত্য ও লোকসাহিত্য, শক্তিবিষয়ক গীতিসাহিত্য, কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর কাব্য। একক মাপকাঠি প্রয়োগ না করায় এই বিভাগও অসংগত। সুকুমার সেনও সামগ্রিক পরিকল্পনা দ্বারা চালিত হয়েছেন বলে মনে হয়না। বিষয় ও ভঙ্গী দু'টোকে তিনি মেলাতে চেয়েছেন—তবে সব সময় নয়। তাঁর বিন্যাস হচ্ছে চর্যাগীতি, পৌরাণিক পাঞ্চালী, নাট্যগীতি পাঞ্চালী, মনসার ব্রতগীত পাঞ্চালী, চৈতন্যাবদান, বৈষ্ণব পদাবলী, বৈষ্ণব সাধনা

নিবদ্ধ ধর্মকথা, যোগীসিদ্ধ কথা, প্রণয়কাব্য, পরীগাথা প্রভৃতি। মজার প্রণালী অনুসরণ করেছেন অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথম খণ্ড বিন্যাস করেছেন কবি ও কাব্যের নামানুসারে—চর্যাগীতিকা, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বিদ্যাপতি, কৃত্তিবাসের রামায়ণ পাঁচালী, মহাভারতের আদিযুগের অনুবাদ ও মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়। দ্বিতীয় খণ্ডের বিভক্তি বিষয়ানুসারে—মঙ্গলকাব্য, চৈতন্যজীবনীকার, বৈষ্ণব পদাবলী, কৃষ্ণলীলা বিষয়ক কাব্য; তৃতীয় খণ্ডে নতুন করে যোগ করেছেন ভঙ্গি এবং লেখকের সম্প্রদায়পরিচিতি—অনুবাদ-সাহিত্য, গাথা সাহিত্য, মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে মুসলমান কবি।

তবে, এই পর্যন্ত অন্তত তিনজন লেখক সব রচনাকে মনে রেখে বিষয় বিন্যাসের কথা ভেবেছিলেন। রমেশচন্দ্র দত্ত বারো থেকে পনের শতকের সাহিত্যকে বলেছেন গীতিকবিতার যুগ, আর ষোল থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত সময়কে অভিহিত করেছেন পৌরাণিক প্রভাবের যুগ বলে। আহমদ শরীফ বিন্যাস করেছেন তিন ভাগে—প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ সাহিত্য, অনুবাদ ও মৌলিক রচনা। তিনি প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ-সাহিত্য নামে কেন আলাদা বিভাগ করলেন সেটা বোঝা গেলনা—অনায়াসে সেটাকে মৌলিক রচনার ভেতরে ফেলা যেত। শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু বিষয়বস্তু অনুযায়ী ভাগ করে পাঁচখণ্ডে বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিহাস রচনার পরিকল্পনা করেছিলেন। প্রথম খণ্ডে আলোচিত হয়েছে চর্যাপদ-বিদ্যাপতি-শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, দ্বিতীয় খণ্ডে অনুবাদ সাহিত্য। অসমাপ্ত বাকি তিনখণ্ডে তাঁর ইচ্ছা ছিল গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্য, মঙ্গলকাব্য ও বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের ক্রমিক অভিব্যক্তির আলোচনা করা। এই কাঠামোতে অবশ্যই ত্রুটি আছে, কিন্তু তাঁর পক্ষে বলা যায় যে, তাঁর অন্তত সামগ্রিক দৃষ্টি ছিল, তদনুযায়ী কাজ করার উদযোগও ছিল।

আসলে আমরা যতই বলিনা কেন যে, আধুনিক যুগের পূর্বকালে বাংলা সাহিত্যে বৈষয়বৈচিত্র্য ছিলনা, জীবন ছিল গতানুগতিক, তবু দেখা যায় সীমিত বিষয়কেও একটিমাত্র মাপকাঠিতে বিন্যস্ত করা সহজ কাজ নয়। বৈচিত্র্যহীনতার মধ্যেও বৈচিত্র্য ছিল, গতানুগতিক মন নতুনতর ভঙ্গীতে প্রকাশের আকাঙ্ক্ষা করত। সেজন্য বিষয় বিন্যাসের কাজটি হয়ে উঠেছে জটিল—ত্রুটিহীন করা প্রায় দুঃসাধ্য।

পাঁচ

আরেক জটিলতা যুগবিভাগ নিয়ে। উনিশ শতকে সেকাজ অনেকটা সহজ ছিল। বিশ শতকে চর্যাপদ পাওয়া গেলে জটিলতা বৃদ্ধি পায় ও প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগের ধারণা জনপ্রিয় হয়। আহমদ শরীফ, কাজী দীন মুহম্মদ, গোপাল হালদার, ভূদেব চৌধুরী, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সেটা অনুসরণ করেন। এটাই সাধারণভাবে স্বীকৃত বিভাগ—তবে বিতর্ক আছে নামকরণ নিয়ে ও সময়সীমা সম্পর্কে। আধুনিক যুগের শুরু বা তথাকথিত মধ্যযুগের শুরু বা সমাপ্তি নিয়ে জটিলতা কম—মতান্তর প্রবল হয় পেছনের দিকে গেলে। আধুনিক যুগের আগের সময়কে পণ্ডিতেরা দুই, তিন, চার বা পাঁচভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করতে চান। একেক জনের মানদণ্ড একেক রকমের—সময়সীমাও এক নয়। বিস্তারিত আলোচনায় না-গিয়ে শুধু প্রথম পর্বের নাম ও কালসীমার উল্লেখ করলেই জটিলতার পরিচয় পাওয়া যাবে। রামগতি ন্যায়রত্ন এর নাম দিয়েছেন আদ্যকাল—শুরু থেকে চৈতন্যের জন্ম ১৪৮৫ সাল পর্যন্ত ধরেছেন শেষ সীমা। রমেশচন্দ্র দত্ত গীতিকবিতার যুগ ধরেছেন ১০০০ সাল থেকে ১৪০০ সাল পর্যন্ত প্রসারিত চারশ বছরকে। দীনেশ-চন্দ্র সেনের মতে এই পর্বের নাম হিন্দু-বৌদ্ধ যুগ—সময়কাল ৮০০ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১২০০ পর্যন্ত। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এর নাম দিয়েছেন প্রাচীন যুগ—সাত শতকের মাঝামাঝি থেকে বার শতকের শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত। মনো-মোহন ঘোষ ও অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই পর্বকে আদি যুগ নাম দিয়ে থেমেছেন ১২০০ সালে এসে—ভোলানাথ ঘোষ নাম একই রাখলেও শেষ সীমা টেনে নিয়ে গেছেন ১৫০০ খ্রীস্টাব্দে। মুহম্মদ এনামুল হক প্রথম পর্বের নাম দিয়েছেন প্রাক্-তুর্কী যুগ; আর কাজী দীন মুহম্মদ প্রাচীন যুগ নামকরণ করে ৬৫০-১৩৫০ এর মধ্যবর্তী সাতশ বছরকে এর পরিধিভুক্ত করেছেন; অপরদিকে জে. সি. ঘোষ প্রথম যুগকে গৌড় যুগ নামে অভিহিত করাই শ্রেয় বোধ করেছেন ও থেমেছেন ১৫০০ সালে এসে।

সুতরাং প্রথম যুগের নাম পেলাম আমরা সাতটি—আদ্যকাল, গীতি-কবিতার যুগ, হিন্দু-বৌদ্ধ যুগ, প্রাচীন যুগ, আদি যুগ, প্রাক্-তুর্কী যুগ ও গৌড় যুগ এবং সমাপ্তি-সময় পাওয়া গেল পাঁচটি—১২০০ সাল, ১৩৫০ সাল, ১৪০০ সাল, ১৪৮৫ খ্রীস্টাব্দ এবং ১৫০০ সন।

এর পাশাপাশি রয়েছে অপর একটি মত—যা বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিহাসকে দুই পর্বে তথা প্রাচীন যুগ ও আধুনিক যুগ নামে বিভক্ত করা যুক্তিযুক্ত মনে করে। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা), দেবেন্দ্রকুমার ঘোষ (প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস), নন্দগোপাল সেনগুপ্ত (বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা) ও তারাপদ ভট্টাচার্য (বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়) এই মতের অনুসারী। সুকুমার সেনও অনেকটা এই মতের পক্ষপাতী—'তিনি প্রাচীন ধারার শেষ' নিয়ে গেছেন 'ঊনবিংশ শতাব্দীর উপক্রম অবধি'। এই বিভাগের কারণ তাঁরা ব্যাখ্যা করেননি, তবে নানা কারণে মতটি বিবেচনাযোগ্য মনে হয়।

ছয়

আধুনিক যুগের পূর্ববর্তী বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার বাধা হিসেবে কাজ করে ইতিহাস-তত্ত্বের সমস্যা, বিষয়-বিভাগ ও যুগবিভাগ-জনিত জটিলতা। জটিলতা বৃদ্ধি পেয়েছে সেকালের সাংস্কৃতিক জীবন, সামাজিক জীবন ও ধর্মের বিবর্তন নিয়ে পূর্ণাঙ্গ গবেষণা না-হওয়ায়। তার সঙ্গে যুক্ত আছে লেখকদের নির্ভরযোগ্য জীবনকাল জানার অনিশ্চয়তা এবং সাহিত্যবিচারের মাপকাঠির অতি নমনীয়তা। সেকালের মানুষ, গদ্যের অভাবে সবই পদ্যে ও পয়ারে রচনা করেছেন। সব-গুলোকে আমরা সাহিত্যকর্মের নিদর্শন বলে গণ্য করে থাকি। শুভংকরের আর্যাও কবিতা, জ্যোতিষশাস্ত্রের পুথিও সাহিত্য এবং ওজু-নামাজ-রোজার নিয়মকানুনও পয়ারে রচিত হওয়ায় সাহিত্যবলে গৃহীত হয়। এভাবে সাহিত্যবিচারের মাপকাঠি অনেক নমনীয় হয়ে উঠেছে। আমাদের মনে হয় এসব ক্ষেত্রে বিচার-বিবেচনা প্রয়োগ করা আবশ্যক।

যুগবিভাগ সম্পর্কে পূর্বেই ইংগিত করা হয়েছে যে আধুনিক যুগের পূর্ববর্তী কালকে একটি যুগরূপে বিবেচনা করতে আমরা আগ্রহী। আসলে আরম্ভ থেকে আঠার শতকের শেষ পর্যন্ত দীর্ঘ হাজার বছরে বাঙালী সমাজের ভূমি নির্ভর মূল কাঠামো প্রায় অপরিবর্তিত থেকেছে—সাহিত্যেও জীবনবোধগত বা দৃষ্টিভঙ্গি গত পরিবর্তন দেখা যায়নি। এই সময়কে প্রাচীন যুগ বলা হয়েছে, আদিযুগ বললেও ক্ষতি নেই—মধ্যযুগও বলা যায়, যদি মধ্যযুগীয় জীবনবোধকে ধর্মের ও দৈবের

ওপর নির্ভরতা, গতানুগতিকতায় বিশ্বাস, গোষ্ঠীবদ্ধতা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অভাব প্রভৃতির সমার্থক ধরা হয়। আমরা কিন্তু চিহ্নিত করতে চাই সামন্ত যুগ নাম দিয়ে। পণ্ডিতেরা বলেন যে, পঞ্চম-ষষ্ঠ শতক থেকে বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে বঙ্গদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হলে দেশের আর্থিক অবস্থায় গুণগত রূপান্তর আসে—ওই পটভূমিতে রাজারা ব্রাহ্মণ, সেনাপতি বা অভিজাতদের নানা শর্তে ভূমিদান করে দেশে নতুন ব্যবস্থার তথা সামন্তব্যবস্থার উদ্ভব ঘটান। সেটা পূর্ণরূপ পায় দশম-দ্বাদশ শতকে এসে। আঠার শতকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর মাধ্যমে বণিকেরা ক্ষমতাসীন না-হওয়া পর্যন্ত এই ব্যবস্থাই বঙ্গদেশে জাঁকিয়ে বসেছিল। নতুন সমাজের ছিল দুই প্রধান স্তম্ভ—সামন্তশাসক ও পুরোহিত শ্রেণী। একের নেশা প্রেম-এডভেঞ্চার-যুদ্ধ, অপরের পেশা ধর্মকর্ম। এরা মাঝে-মাঝে পরস্পর মারামারি করেছে, কিন্তু অধিকাংশ সময় মিতালী করেছে, কবিরা ছিলেন এদের অনুগৃহীত। এদের পৃষ্ঠপোষকতায় যে-সাহিত্যের পুষ্টি হয় সেখানে প্রেম ও ধর্মই প্রধান—কখনো আলাদা-আলাদা ভাবে, কখনো জড়াজড়ি করে। সেজন্য এই বিরাট সময়ের সাহিত্যকে একই যুগের পটভূমিতে আলোচনা করা সুবিধাজনক। তার নাম হবে সামন্তযুগের সাহিত্য। পরের কালের সাহিত্যকে তথা আধুনিক কালের সাহিত্যকে বুর্জোয়া যুগের সাহিত্য নাম দিলে আরো সুন্দর হয়। এই ভাগাভাগির সুবিধা অনেক—সাম্প্রদায়িক পণ্ডিতদের ঝগড়াঝাটি করার সুযোগ কমে আসে—সমাজের কাঠামোর সঙ্গে ওপর-কাঠামোর সম্পর্ক সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা হয়।

এবারে আসে রচনাবিন্যাসের ব্যাপারটি। এক্ষেত্রে একক মাপকাঠি প্রয়োগ করা সংগত। রচনাপদ্ধতি, রচনার রূপ বা আঙ্গিক, এবং অবলম্বিত বিষয়—তিনটির যে-কোন একটি ব্যবহার করা যায়। আহমদ শরীফ আংশিকভাবে প্রথমটির স্বীকৃতি দিয়ে অনুবাদ ও মৌলিক এই দুই বৃহৎ ভাগে সব লেখা বিন্যস্ত করেছিলেন। রচনার আঙ্গিক মাপকাঠি হলে গীতিকবিতা, আখ্যায়িকা কাব্য ও বর্ণনামূলক কাব্য প্রভৃতি শ্রেণী-বিন্যাস আসে। গীতিকবিতার ধারায় আলোচিত হবে চর্যাপদ, গীতি-বৈষ্ণব পদাবলী, শাক্ত পদাবলী, বাউল গান ও কবিওয়ালার গান প্রভৃতি; শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, মঙ্গলকাব্য, প্রণয়কাব্য, চরিতকাব্য, রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবতের অনুবাদ, বিজয়-কাব্য, ইসলামী পৌরাণিক কাব্য ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত হবে আখ্যায়িকা কাব্যের ধারায়; আর বর্ণনামূলক

অংশে ফেলা যেতে পারে সূফী ধর্ম ও ইসলামী শাস্ত্র বিষয়ক রচনাবলী। বিষয়বস্তুকে বিন্যাসের ভিত্তি ধরলে প্রণয়োপাখ্যান ও ধর্মীয় রচনা এই দুই বড় ভাগ প্রথমে করা যায়। ইউসুফ-জোলেখা, লায়লী-মজনু, পদ্মাবতী, চন্দ্রাবতী প্রভৃতি রচনা প্রথম শাখার অন্তর্গত; ধর্মীয় রচনার উপবিভাগ হবে চারটি—বৌদ্ধ ধর্মের, হিন্দু ধর্মের, ইসলাম ধর্মের ও ধর্মসমন্বয়ের পটভূমিতে রচিত সাহিত্য। বৌদ্ধ ধর্মের পটভূমিতে রচিত হয়েছে চর্যাপদ ও নাথ সাহিত্য, হিন্দুধর্মের পটভূমিতে রামায়ণাদির অনুবাদ, পদাবলী, চৈতন্যচরিত, মঙ্গলকাব্য, কবিওয়ালাদের গান প্রভৃতি; ইসলামী বিষয় নিয়ে লিখিত হয়েছে শরীয়ত—মারিফত বিষয়ক কাব্য, ইসলামিক পৌরাণিক কাহিনী-কাব্য, মসিয়া কাব্য প্রভৃতি; আর হিন্দুধর্ম ও ইসলাম ধর্মের সমন্বয়ের ভিত্তিতে রচিত হয়েছে সত্যপীর, সত্যনারায়ণ ও পীরগাঁথা প্রভৃতি।

সবশেষে আসে ওই জটিল প্রশ্ন—তত্ত্ব ও পদ্ধতির প্রসঙ্গ। এ বিষয়ে অনেক বলার ও আলোচনার দরকার—আমরা শুধু সংক্ষেপে সাধারণভাবে কয়েকটি ইংগিত দিতে চাই :

(ক) সেসব রচনাই আলোচনার অন্তর্গত হবে, যেগুলোর অন্তত কিছুটা সাহিত্যমূল্য আছে;

(খ) আলোচনা হবে কালানুক্রমিকভাবে;

(গ) ইতিহাসগ্রন্থ নিছক তথ্যের সংকলন হবেনা, বরং রচনা শৈলী ও প্রকাশভঙ্গী সরস ও চিত্তাকর্ষক হয়ে সাহিত্যগুণ মণ্ডিত হবে;

(ঘ) সমাজ, সংস্কৃতি, জাতীয় মানস বা যুগচৈতন্য ইত্যাদি বিষয়ের ইতিহাস নয়, বরং সাহিত্যের বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ উপাদান যথা বিষয়-বস্তু ও আঙ্গিক প্রভৃতির 'ইতিহাস' এতে আলোচিত হবে; যে-সমাজ এই সাহিত্য ধারণ করে তার কাঠামো পটভূমিতে আলোচিত হবে।

(ঙ) 'ইতিহাস' বলতে বোঝানো হচ্ছে বর্ণিত বিষয়ের উদ্ভব-বিকাশ-বিলয়ের প্রবাহ কার্যকারণ সম্বন্ধে প্রদর্শন করা। সে-প্রসঙ্গে প্রাথমিক প্রয়োজন হচ্ছে বিকাশ বা অবক্ষয় চিহ্নিত করার মাপকাঠি ঠিক করে নেওয়া;

এভাবে রচিত হলে, আমাদের ধারণা, সাহিত্য-ইতিহাস সাহিত্য হবে, ইতিহাস হবে এবং সাহিত্যের ইতিহাস হবে।

[ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আয়োজিত ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ জন্ম-শতবার্ষিকী (১৯৮৫) উপলক্ষে আয়োজিত সেমিনারে পঠিত।]